কোচিং সেন্টারের কারসাজিতে সরকারি মেডিকেলে ভর্তি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

১০ অক্টোবর ২০১৯, ১৩:৪০
আপডেট: ১০ অক্টোবর ২০১৯, ১৩:৪৯

মেডিকেল

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাননি। কিন্তু মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় ৭৩ নম্বর পেয়ে সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ হয়েছে। ঢাকার মুগদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া এমন কিছু শিক্ষার্থী সম্পর্কে শিক্ষকেরা বলেছেন, মেডিকেলে পড়ার ন্যূনতম মানও তাঁদের নেই। ভর্তি পরীক্ষায় কীভাবে তাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন, সেটা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না।

জানা গেছে, গত বছর (২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষ) খুলনার থ্রি ডক্টরস কোচিং সেন্টার থেকে কোচিং করেছেন–এমন ২৮ জন ঢাকার মুগদা মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পান। এই কোচিং সেন্টার থেকে গত বছর মোট ২৭৩ জন শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন সরকারি মেডিকেলে ভর্তি হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ১৮ জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং ৮৬ জন ঢাকার অন্য চারটি সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এর আগের বছর কোচিং সেন্টারটি থেকে বিভিন্ন মেডিকেলে ২৬৪ জন ভর্তি হয়েছিলেন।

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একটি গোয়েন্দা সংস্থা এ বিষয়ে অনুসন্ধান শেষে এক প্রতিবেদনে বলেছে, খুলনার এই কোচিং সেন্টার ভর্তি-বাণিজ্যের মাধ্যমে ‘মেধাহীন’, ‘অযোগ্য’ ছাত্রছাত্রীদের মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ করে দিচ্ছে। জনপ্রতি ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকা করে নিয়ে যাচ্ছে। এই ভর্তি-বাণিজ্যের মাধ্যমে বছরে শতকোটি টাকার বেশি অবৈধ লেনদেন হচ্ছে।

গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উদাহরণ হিসেবে কিছু শিক্ষার্থীর ফলাফল বিবরণীর বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়, যাঁরা থ্রি ডক্টরসে কোচিং করেছেন। তাতে দেখা যায়, তাঁরা কেউ এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পাননি। তবে ভর্তি পরীক্ষায় ৭৩ করে নম্বর পেয়েছেন। একজন ৭৩.২৫ নম্বর পেয়েছেন। মুগদা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়, তাঁদের পড়াশোনা ও জ্ঞান এত নিম্নমানের যে তাঁরা কীভাবে মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার মতো কঠিন পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন, তা বোধগম্য নয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মুগদা মেডিকেলে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ১২ জন, ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ২১ জন ভর্তি হন, যাঁরা খুলনার ওই কোচিং সেন্টারে কোচিং করেছেন। তাঁদের লেখাপড়ার মানও অত্যন্ত নিম্ন। শিক্ষকদের আশঙ্কা, তাঁরা কোনো কারসাজির মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করেছেন।

এ নিয়ে গতকাল বুধবার মুগদা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম নবী তুহিনের সঙ্গে *প্রথম আলোর* কথা হয়। তিনি বলেন, এখানে ২০১৫ সালে এমন কিছু শিক্ষার্থী ভর্তি হন, যাঁদের মেডিকেলে পড়ার ন্যূনতম যে মান, সেটা ছিল না। তবে তিনি গত দুই শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে এমন মন্তব্য করেননি, যাঁদের উদাহরণ গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

যুক্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ‘সিন্ডিকেট’

সরকারি ওই গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়, কোচিং সেন্টারের এই ভর্তি-বাণিজ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি সিন্ডিকেট (চক্র)। এই ভর্তি-বাণিজ্যের সঙ্গে মেডিকেল শিক্ষা শাখার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মো. আবজাল সরাসরি জড়িত ছিলেন। তাঁর সব কাজের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিকিৎসাশিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন শাখার সদ্য সাবেক পরিচালক আবদুর রশীদের নামও এসেছে গোয়েন্দা প্রতিবেদনে। তাঁদের কাছ থেকে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদও সুবিধা পান বলে গোয়েন্দা প্রতিবেদনে এসেছে। তবে মহাপরিচালক *প্রথম আলো*কে বলেন, এমন সুবিধা পাওয়ার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

এ বিষয়ে আবজালের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে ঢাকা ও অস্ট্রেলিয়ায় বাড়িসহ তাঁর বিপুল অর্থ-সম্পদের খোঁজ পাওয়ার পর আবজাল ছয় মাস ধরে পলাতক। ইতিপূর্বে খবর বেরিয়েছিল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন কেনাকাটায় দুর্নীতি করে আবজাল বিপুল সম্পদ গড়েছেন, যার সঙ্গে অধিদপ্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তারও যোগসাজশ ছিল। এখন বেরিয়ে এল ভর্তি-বাণিজ্যেও যুক্ত ছিলেন তিনি।

চলতি বছরের শুরুতে আবজালের দুর্নীতির খবর ফাঁস হওয়ার পর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিকিৎসাশিক্ষা শাখার পরিচালক পদ থেকে আবদুর রশীদকে বদলি করা হয়। ভর্তি-বাণিজ্যের কোনো চক্রের সঙ্গে তাঁর জড়িত থাকার অভিযোগ ঠিক নয়, দাবি করে তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘খুলনার থ্রি ডক্টরস কোচিং সেন্টার চিনি। যেসব কোচিং সেন্টারকে নজরদারি করতাম, এটা তার একটা।’

যেভাবে কারসাজি

গোয়েন্দা সংস্থার অনুসন্ধানে এসেছে, থ্রি ডক্টরস কোচিং সেন্টার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিন্ডিকেটের সঙ্গে যোগসাজশ করে একশ্রেণির শিক্ষার্থীকে সরকারি মেডিকেলে ভর্তি করার জন্য চুক্তি করে। চুক্তি করা শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার বহু নির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে উত্তরপত্রের (ওএমআর শিট) ঘর খালি রাখার জন্য বলা হয়। পরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিন্ডিকেট ওই উত্তরপত্রের সঠিক ঘর ভরাট করে দেয়। এ কারণে মেডিকেল শিক্ষা গ্রহণের ন্যূনতম মান নেই, এমন শিক্ষার্থীও ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন খুলনার ওই কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে।

এই বিষয়ে কথা হয় এই কোচিং সেন্টারের মালিক ইউনুছ খানের (ডা. তারিম) সঙ্গে। তিনি দাবি করেন, প্রশ্নপত্রের কোনো কিছুতেই তিনি জড়িত নন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো অভিযোগ নেই। তাঁর এখান থেকে কোচিং শিক্ষার্থীদের অনেকে কেন ভর্তি পরীক্ষায় ৭৩ নম্বর পান, তা তিনি জানেন না।

ডাক্তার বানানোর কারিগর?

গত দুই দিন খুলনায় ঘুরে দেখা যায়, সারা শহর থ্রি ডক্টরসের অনেক পোস্টার। তাতে কোচিং সেন্টারের মালিক ডা. তারিমের ছবি ছাপানো। ছবির নিচে লেখা 'ডাক্তার বানানোর কারিগর'।

কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষের দাবি, গত ১৮ বছরে তাদের কোচিং সেন্টারের ৪ হাজার শিক্ষার্থী বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। গত বছর কেবল সরকারি মেডিকেলেই ভর্তি হন ২৭৩ জন।

খুলনার সিমেট্রি রোডে একটি বহুতল ভবনে অবস্থিত এই কোচিং সেন্টারে কেবল খুলনা ও আশপাশের জেলা নয়, দূরের বিভিন্ন জেলার শিক্ষার্থীও কোচিং করেন। এই কোচিং সেন্টার ঘিরে খুলনা শহরে কয়েকটি ভবনে ছাত্রাবাস গড়ে উঠেছে।

কোচিং সেন্টারের মালিক ইউনুছ খান ওরফে ডা. তারিম খুলনা মেডিকেলের ছাত্র ছিলেন। তিনি ছাত্রলীগের খুলনা মেডিকেল শাখার সভাপতি ছিলেন। তাঁর দাবি, তাঁর মতো জনপ্রিয় নেতা আর আসেননি।

ডা. তারিম বলেন, 'আমি ২০০১ সালে প্রথম বর্ষে পড়া অবস্থা থেকে কোচিং ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। সেটা এখনো অব্যাহত। এটা আমার হালাল রুজির পথ।'

এ কথা বললেও ডা. তারিম একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার। খুলনা শহরের কেন্দ্রস্থল রয়েল মোড়ে অবস্থিত ফাতিমা হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ১১ জন মালিকের একজন তিনি।

দেশে এত কোচিং সেন্টার থাকতে বিভিন্ন জেলা থেকে তাঁর কোচিং সেন্টারে কেন এত শিক্ষার্থী আসেন—এ প্রশ্নের জবাবে ডা. তারিম বলেন, তাঁদের কোচিংয়ে দেখভালের ভালো ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে তিনভাবে পড়ানো হয়। বড়

ব্যাচে, যাতে ৫০-৬০ জন শিক্ষার্থী একসঙ্গে পড়েন। আবার একজন শিক্ষক বিশেষ বিষয়ে ১০-১২ জনের ছোট ব্যাচে পড়ান। কেউ চাইলে বাসায় গিয়েও পড়ানো হয়।

খুলনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলো*কে বলেন, ডা. তারিমের হাতে খুলনা মেডিকেল কলেজ ও এ শহরের চিকিৎসাব্যবস্থা অনেকটা জিম্মি। তাঁর মালিকানাধীন ফাতিমা হাসপাতালে রোগী দেখার জন্য তিনি অনেক জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকের ওপর চাপ দেন বলেও অভিযোগ আছে। যদিও তারিম *প্রথম আলো*কে বলেছেন, তিনি চাপ নয়, অনুরোধ করেন মাত্র।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, খুলনায় মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় যাঁরা পরিদর্শক থাকেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ডা. তারিমের ঘনিষ্ঠ। তাঁরা পরীক্ষার হলে তাঁদের শিক্ষার্থীদের সঠিক উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেন, এমন অভিযোগও আছে। যদিও তারিম নিজে কখনো পরীক্ষার হলে থাকেন না।

জানা গেছে, ভর্তি পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ বাইরের প্রতিষ্ঠানকে (আউটসোর্সিং) দিয়ে করানো হয়। এত দিন যে দুটি প্রতিষ্ঠান কাজটি করত, এবার তাদের বাদ দিয়ে নতুন একটি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে। কারণ হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ *প্রথম আলো*কে বলেছেন, আগের দুটির একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ থাকায় নতুন প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে।

মহাপরিচালক দাবি করেন, মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় বা উত্তরপত্রে কারসাজি করা সম্ভব নয়। এ কাজে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা থাকেন। তাঁদের নজরদারিতে কাজটা হয়। খুলনার থ্রি ডক্টরস কোচিং সেন্টারের নামও শোনেননি বলে জানান।